Vol. 54 | No. 1 | 2016

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

সমর সেন : চেতনার রূপাঙ্গিক

Volume	54
Issue	1
Year	2016
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Md. Bakebillah
Published online	October 1, 2016
DOI	10.62328/sp.v54i1.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v54i1.7
Pages	183-200
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

সমর সেন : চেতনার রূপাঙ্গিক

মো. বাকীবিল্লাহ*

সারসংক্ষেপ : মধ্যবিত্ত মানুষের যাপিত জীবনের বহুবর্ণিল সংকট–সম্পর্ক ক্রূরতা, যৌনজীবনের জটিলতা, যন্ত্রসভ্যতার নির্মমতার রূপায়ণ ত্রিশোত্তর কবিদের প্রিয় অনুষঙ্গ। সমর সেন বিষয়ের ক্ষেত্রে অনেকাংশে তাঁদের সমগোত্রীয় হলেও তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিতে, বোধে, প্রকাশে রয়েছে একধরনের তীব্রতা-তীক্ষ্ণতা, যা তাঁকে অন্যদের থেকে করেছে স্বতন্ত্র। তাঁর প্রধান পরিচয় খাঁটি গদ্যছন্দের ব্যবহারে। এ প্রবন্ধের লক্ষ্য, সমর সেনের সেই ভিন্নার্থক দৃষ্টিভঙ্গি আর বিচিত্র উপলব্ধির সামষ্টিক পরিচয় তুলে ধরা।

বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্য প্রভাবিত যে আধুনিকতার সূত্রপাত, সমর সেন সেই ধারার প্রলম্বিত উত্তরাধিকার। আধুনিক মানুষের মানসদ্বন্দ্ব, জীবন-সংঘাত, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি যে কত বিচিত্র হতে পারে তার স্বরূপ উপস্থাপিত সমর সেনের কবিতায়। অবশ্য, জীবনার্থের নির্দিষ্ট কোনো অর্থ, বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য খোঁজ না করাই শ্রেয়। সে-কাজটি ঠিকঠাক সম্পন্ন করেছিলেন শব্দের জন্মের পর সেই শব্দের ব্যবহারকারী প্রথম মানব; কেননা তিনি ছিলেন কোনোরূপ বৈশিষ্ট্য ব্যতিরেকে শব্দের প্রথম ব্যবহারকারী।[১] তাই বিষয় কী, তা মুখ্য নয়; বরং প্রকৃতপক্ষে তা কী অর্থে ব্যবহৃত হবে সে সংজ্ঞায়ন করে নেওয়া জরুরি। ত্রিশ-ত্রিশোত্তর সময়ের বৌদ্ধিক কবিগোষ্ঠী কবিতার ক্ষেত্রে এই নির্মাণযজ্ঞ সুসম্পন্ন করেছিলেন প্রচলিত ধারার বাইরে এসে। তাঁরা কবিতার বিষয়ভাবনার ক্ষেত্রে বহুবর্ণিল-বহুবিশৃঙ্খল বৈশিষ্ট্যের সমন্বয় সাধন করেছেন; প্রকরণের ক্ষেত্রে স্বকীয়তা সন্ধান করেছেন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মাধ্যমে। সমর সেন (১৯১৬-১৯৮৭) সেই ধারার বিশিষ্ট কবি।

২.

সমর সেনের বেড়ে ওঠা দৈশিক পরাধীনতা ও বৈশ্বিক সংকট কালপর্বে। পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বের ব্যভিচারিতায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) যখন আসন্ন,

*প্রভাষক, ফোকলোর বিভাগ, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ত্রিশাল, ময়মনসিংহ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন, জাপানের আক্রমণে চিনের বেহাল দশা, অজানা ভবিতব্যের প্রতীক্ষায় ভারতভূমি। বিশ শতকের শুরু থেকেই ভারতবাসীর জীবনে নানামাত্রার আঘাত আসতে শুরু করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সামগ্রিক পরিণামকে জনগণের সামনে উন্মোচিত করে তোলে। ভাগ করো, শাসন করো নীতির পরিকল্পনা বাস্তবায়নে বাংলা ভাগ, আবার নানামুখী চাপ-প্রতিরোধের মুখে বঙ্গভঙ্গ রদ – এসব ঘটনার ফল ছিলো সুদূরপ্রসারী। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের মতো ঘটনায় স্পষ্ট হয়ে ওঠে ভারতীয়-ব্রিটিশের সম্পর্ক এবং ভবিষ্যৎ। এই উত্তেজনা বাড়তে থাকে দিনের পর দিন। এমন উত্তাল সময়ের মধ্যে সমর সেনের শৈশব কাটে। চারপাশের ঘটনা দারুণভাবে ঝড় তোলে তাঁর সচেতন হৃদয়ে। সমকালের সামূহিক বিপর্যয়কে সমর সেন তাই সংবেদনশীল শিল্পীর অনুভূতি দিয়ে স্পর্শ করেছেন, প্রকাশ করেছেন নবতর ছন্দে, প্রতীক-পুরাণের আশ্রয়ে, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপাত্মক ভঙ্গিতে, ভাষিক-আলঙ্কারিক সৌকর্যের আবরণে। তিনি কেবল সময়-শিল্পের ভাষ্যকার নন, তাঁকে স্মরণ করবার মতো অন্য কারণও আছে। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিমত :

> সময়ের ছায়াকে কবিতায় ভাসিয়ে তোলা কবির কাজ বটে, কিন্তু সেটিই তাঁর চূড়ান্ত কাজ নয়। সেই স্বভাবত অপসৃয়মান ছায়াকে, আপন প্রতিভার রেখায় মূর্ত করা, কালজ উপাদানের সাহায্যেই গড়ে তোলা এক কালোত্তরকে – এটাই বড় কবির কাজ। (২০০২ : ২৩৪)।

সমর সেনের কাব্যপ্রতিভায়[২] রয়েছে এই 'কালজ উপাদান', যা তাকে কালোত্তরের মহিমায় উত্তীর্ণ করে অবলীলায়; পাঠককে প্রাণিত করে ব্যতিক্রমী বৌদ্ধিক জগতে বিচরণের।

৩.

সমর সেন সময় সচেতন নাগরিক কবি। "নগর জীবনের নোংরামি ক্লান্তি" (সুকুমার, ২০০৭ : ৩৮৭) তাঁর কবিতায় বিভিন্নভাবে প্রতিধ্বনিত হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি ছিলেন পূর্ববাংলার দীনেশচন্দ্র সেনের[৩] পৌত্র; গ্রামীণ জীবনে ছিল তাঁর স্বাভাবিক অধিকার। কিন্তু তাঁর জীবন কাটে শহরে-নগরে, মধ্যবিত্ত শ্রেণিবৃত্তে। নগর বাস্তবতায় মধ্যবিত্ত মানুষের যে ত্রিশঙ্কুদশা, সে সব নিত্যদৃশ্যের উপস্থিতি সমর সেনের কবিতায়। লিবিডো-তাড়িত আধুনিক মানুষের বিচিত্র জটিলতার রূপায়ণে তিনি সিদ্ধহস্ত; সত্য যার সৌন্দর্য। যুদ্ধ- অভিশপ্ত দুর্ভিক্ষের বিবরণ উপস্থাপন করতেও ভোলেন না সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী এই কবি। নগরজীবনের দ্বন্দ্বমুখর জটিলতা, সমকালীন রাজনৈতিক বাস্তবতা, আধুনিক সময় জর্জরিত মানুষের জীবনে নারী, প্রেম, যৌনজীবনের শিল্পময় সৌন্দর্যের উপস্থাপনা এ প্রবন্ধ।

৩.১

আধুনিক জীবনবেদের প্রধানতম অনুষঙ্গ নগর। এ জীবনের দ্বন্দ্ব-কুটিলতা, হতাশা-নৈরাশ্য, রোগ-শোক, বিকার-বিক্ষোভ, ক্লেদ-ক্লান্তি, প্রেম-অপ্রেম, স্বপ্ন-দুঃস্বপ্নকে ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ধারণ করে আধুনিক মানুষ। এই মানুষগুলোর কামনা-বাসনার স্তর কত বিচিত্র হতে পারে, কত স্বতন্ত্র হতে পারে, তার নগ্নরূপ উন্মোচনে সমর সেন নির্মোহ চেতনার অধিকারী। "বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে সত্যিকার অর্থে সমর সেনই প্রথম নাগরিক কবি।" (শামসুর, ২০০২ : ১৮)। "ধনতান্ত্রিক যান্ত্রিক সভ্যতার ফল যে আধুনিক শহর তিনি তার কবি, কারণ তিনি বর্তমান সভ্যতার বিষণ্ন বন্ধ্যাত্বের কবি।" (অশ্রুকুমার, ১৩৯২ : ২৩২)। তাই শহরের বুকে যখন 'নিঃসঙ্গ পশুর মতো রাত্রি আসে' তখন কবি চমকে ওঠেন 'কালিঘাটের ব্রিজের উপরে' বেজে ওঠা 'লম্পটের পদধ্বনি'তে। তাঁর অপেক্ষা এক অনির্দিষ্ট, অনির্দেশ্য নিশিকন্যার জন্যে, যাকে তিনি কামনা করেন কোন এক স্বর্গভ্রষ্টা উর্বশীর অনুভববেদ্যতায়। বিষণ্ন জীবনের বেদনার্ত মুহূর্তকে একটু রাঙিয়ে নেবার জন্যে বেকার যুবকের প্রত্যাশিত পদচারণা সেখানে। অবশ্য, উর্বশীকে কাছে পেতে প্রয়োজন 'দশ টাকার'। তাহলেই 'শাড়ির আর তাড়ির উল্লাসে' 'চিত্ত আত্মহারা' হয়ে যায়, নেচে ওঠে 'রক্তধারা' ধমনীতে। নগর জীবনের বিধ্বস্ত-বিড়ম্বিত অথচ অনিবার্য পরিণামকে কবি রূপায়ণ করেছেন নানা ভঙ্গিতে। 'নাগরিক' কবিতার মধ্যে কবি এই ভয়াবহ পরিণতিকে বিবৃত করেছেন নগ্ন নির্মমতায়:

> কাল সকালে যখন সূর্য উঠবে!
> কলেরা আর কলের বাঁশি আর গণোরিয়া আর বসন্ত
> বন্যা আর দুর্ভিক্ষ
> শৃনন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ
> (সমর, ১৩৮৮ : ৩৯)

কবি মনে করেন, মানুষের জীবনে যন্ত্রসভ্যতা নানা রং এনে দিয়েছে, করেছে সুখী, সমৃদ্ধ – এ কথা সত্য; কিন্তু বিনিময়ে হরণ করেছে গ্রামীণ সভ্যতার শান্তি-স্বস্তি। মানুষের উদ্‌যাপনের অসংখ্য উপাদান যেমন নগর সভ্যতার দান তেমনই তা বয়ে এনেছে রোগ, শোক, স্বার্থপরতা, রেশারেশি, হানাহানির অভিশাপ। তাই অনিবার্য এই 'শৃনন্তু বিশ্বে' কবি নিজেকে 'অমৃতস্য পুত্রাঃ' বলে দাবি করেন, ব্যঙ্গের সুরে।

বস্তুবিশ্বের এই প্রায়োগিক জীবনে 'কামনার বিশাল আশা' পূরণের জন্য প্রয়োজন অর্থের, অথচ 'ট্যাকেতে টাকা নেই', কামনা তাই অবদমনে, নির্বাসনে। চারদিকে শুধু অপেক্ষমান কর্কশ 'কাকের কণ্ঠস্বর' আর 'সভ্যতা ধ্বংসের গান'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালপর্বে মানবসভ্যতা চরম ক্রান্তিকাল পার করেছে,

ভারতবর্ষের জন্য এই সংকটকাল ছিল আরও দীর্ঘ, যন্ত্রণাময়, ক্লান্তিকর। সময়যন্ত্রের এই নিষ্ঠুর আঘাতটা এসেছিল সমগ্রজীবনে; বিশেষত, নাগরিক মধ্যবিত্ত মানুষের ওপরে। ঈশ্বরের সাজানো সেই 'অপরূপ' দৃশ্যসজ্জিত পৃথিবী কবি কামনা করেন না। কেননা সেখানে 'দৈনিক পত্রিকায়' 'চোখ মেলে' তাকালেই দেখা যায় 'নারী ধর্ষণের ইতিহাস'। তাই কবির প্রার্থনা, 'সেইদিন লুপ্ত হোক যেদিন মানুষ পৃথিবীতে আসে'। জীবনযন্ত্রণা কতটুকু অসহ্যমাত্রায় পৌঁছালে মানুষ নিজের ধ্বংস কামনা করে! বস্তুত, কবি জগত-জীবনের এই অনাচারকে, ধ্বংসের মহাযজ্ঞানুষ্ঠানকে ব্যঙ্গ করে তাকে 'অপরূপ' বলেছেন।

সমর সেন মধ্যবিত্তের জীবনছবি অঙ্কনে যেমন ঠোঁটকাটা তেমনি সহানুভূতি পরায়ণ। "মধ্যবিত্তের সঙ্গে একাত্মতা সমর সেনের খ্যাতিরও একটি বড় কারণ। তাঁর কবিতায় মধ্যবিত্ত শ্রেণি নিজের অন্তরের কথা শুনতে পান।" (বাসন্তী, ১৯৯৪ : ৩৭৬) মধ্যবিত্তের অনুর্বর, অনুদ্দাম, ক্লান্ত, বন্ধ্যা, ম্লান জীবনে স্বর্গজাত উর্বশী অথবা সামান্য মর্তমানবীর জন্য যে ব্যাকুল প্রতীক্ষা; সে কি কখনও আসে? কবির বেদনার্ত হৃদয়ের চিৎকার :

> তুমি কি আসবে আমাদের মধ্যবিত্ত রক্তে
> দিগন্তে দুরন্ত মেঘের মতো।
> কিম্বা আমাদের ম্লান জীবনে তুমি কি আসবে,
> হে ক্লান্ত উর্বশী,
> চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ন মুখে
> উর্বর মেয়েরা আসে :
> (সমর, ১৩৮৮ : ২৭)

'উর্বশী' হয়তো আসবে, হয়তো আসবে না! অসহায় মধ্যবিত্ত নাগরিক কবির প্রতীক্ষা ছাড়া কিবা করার থাকতে পারে? কবি তাই 'কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধিত ক্লান্তি, কত দীর্ঘশ্বাস' নিয়ে বাসনার উন্মাদে মগ্ন হয়ে থাকেন। মজার বিষয়, 'উর্বশী' কবিকে নিরাশ করে না। বহুপ্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে, অনেক সাধ-স্বপ্ন পূরণের নিমিত্তে উর্বশী আসে কবির সদনে। কিন্তু 'উর্বশী'কে কাছে পেয়ে কবি কিংকর্তব্যবিমূঢ়; আনন্দে আত্মহারা হয়ে নয়, অন্য কোনো বিষণ্নতায়। বিষ্ণু দে যখন প্রাচ্যের উর্বশীকে পাশ্চাত্যের আর্টেমিসের সাথে তুলনা করেন, দুই মেরুর ভাবনার সমান্তরাল অথবা বৈপরীত্য তুলে ধরে স্ব-ঐতিহ্যের স্বাতন্ত্র্য অন্বেষণে সচেষ্ট, সমর সেন তখন আরেক ধাপ এগিয়ে যান। স্বর্গের উর্বশী, যে বা যাঁরা এতোদিন শুধু দেবতাদের দখলে ছিলেন তাদেরকে সমর সেন টেনে এনেছেন মধ্যবিত্ত-বেকার যুবকের নিরানন্দ ঘরে। কিন্তু প্রেয়সীকে নিয়ে উদ্‌যাপন-উপভোগের জন্য যে সময়, পরিস্থিতি, পরিবেশ বা অবকাশ দরকার তা তো এই মধ্যবিত্ত কবির নেই। তার 'সময় কাটে' ট্রামের অবিরাম মুখর শব্দে', বিরক্তিকর সব 'অধ্যাপকদের বক্তৃতায়', আর অনিচ্ছুক

'সাড়ে-বত্রিশ ভাজার আমন্ত্রণে'। ঠিক এমনই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন আর এক সময়শাসিত কবি বিষ্ণু দে। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর প্রিয়তমার 'পোস্টকার্ড এল' 'ছড়টানা লয়ে'। কবি প্রিয়াভিসারে বের হয়েছেন; অথচ যানজটে পড়ে তাঁর বেহাল দশা :

বাসের একি শিংভাঙ্গা গোঁ!
যন্ত্রের এই খামখেয়াল!
এদিকে আর পঁচিশ মিনিট–
ওরে বিহঙ্গ, ওরে বিহঙ্গ মোর। (বিষ্ণু, ১৯৯৩ : ৭৮)

সার্বিক যুগপরিবেশ যখন এমন বিষণ্ন-মেদুর তখন 'উর্বশী' বা অন্য কোনো উপভোগ্য বস্তু কালদগ্ধ আধুনিক কবিকে কীভাবে সুখ-স্বস্তি এনে দেবে?

নগরজীবনের ছবি তিরিশের সব কবির কবিতায় কমবেশি এসেছে কিন্তু সমর সেনের অনুভবের তীব্রতা অন্যদের থেকে আলাদা। তাই 'উলঙ্গ শব', 'কর্কশ বালু', 'বন্ধ্যা নারী', 'ধূর্তকাক', 'ভ্রান্তকুকুর', 'লোহিত হলুদ চাঁদ', 'মড়কের কলরোল' এবং 'উচ্ছিষ্ট নিয়ে ভিখিরী' ও 'কুকুরের' মাঝে যখন 'ঝগড়া বাধে', কবি তখন বলে ওঠেন, 'আমাদের মুক্তি নেই, আমাদের জয়াশা নেই'। বিষণ্নতার সুর বেজে ওঠে কবির বীণায়:

রাত্রি হয়ে এল শেষ
এবার ফিরাও মোরে।
(সমর, ১৩৮৮ : ৫২)

'মোটরের আওয়াজ' নির্ভর সভ্যতার বাহ্যিক চাকচিক্যময় জীবন ক্ষণিক মুগ্ধতা ছড়ালেও অচিরেই তার অন্তঃসারশূন্য রূপটিও উন্মোচিত হয়ে পড়ে। কবি এই সমাজ সভ্যতায় একসময় মনে করেন :

পলায়ন জীবিকা আমার,
পৃষ্ঠদেশে চিহ্ন অসংখ্য প্রহরের।
(সমর, ১৩৮৮ : ৫৫)

'পশ্চিমের করুণ আকাশে' 'রক্তকরবীর' উদয় আর 'ইন্দ্রজিতের কুণ্ডল' দেখে কবি পলায়ন করতে চান। কিন্তু কোথায় যাবেন তিনি? 'অশান্ত সূর্যাস্তের' মধ্য দিয়ে সমর সেন কি বিকল্প জীবনসভ্যতার অন্বেষায় লিপ্ত? সেই জগৎ, সেই আশ্রম কি কোনো 'নির্জন গ্রাম' সভ্যতা? নাকি অন্য কোন শান্তির নীড়? যেখানে কবি পলায়নপর সময়ে শরণ নিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলতে চান। কবির নগর জীবনাভিজ্ঞতা পাঠককে সমর্পিত করে এইসব পরিস্থিতির মুখে। অতঃপর কবি তাঁর সিদ্ধান্ত পাঠককে জানিয়ে দেন :

তোমাকে নিয়ে কোথাও সরে পড়ি।
নদীর উপরে যেখানে নীল আকাশ নামে গভীর স্নেহে,
শেয়াল সঙ্কুল কোনো নির্জন গ্রামে
কুঁড়েঘর বাঁধি।
(সমর, ১৩৮৮ : ৫৪)

অবশ্য সমর সেনের মধ্যে এমন পলায়নপর মানসিকতা খুব কমই দেখা যায়। বরং তিনি নগরজীবনের বাধ্য বাস্তবতাকে মেনে নিয়ে চলতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন বরাবর।

৩.২

স্বদেশের মুক্তি সমর সেনের প্রধান কাঙ্ক্ষা। তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল সমাজতন্ত্র ঘেঁষা; কিন্তু তিনি পুরোমাত্রায় মার্কসবাদী কবি কিনা তা নিয়ে বিতর্ক আছে। কবিতার মধ্যে কবি সাড়ম্বরে ঘোষণা করেছেন, 'আমি মার্ক্সিস্ট' অথচ 'বাবু বৃত্তান্তে' বলেছেন, "এটা নয় যে আমি সক্রিয় কর্মী ছিলাম। আমার গণ্ডী সীমাবদ্ধ ছিল মধ্যবিত্ত শ্রেণিতে, সে গণ্ডী কখনো কাটিয়ে উঠতে পারিনি।" (সমর, ১৯৮১ : ৩১) তার সামগ্রিক কাব্যপরিসর বিবেচনায় আনলে দেখা যায়, তিনি জাতি-রাষ্ট্রের সমস্যার ছবি আঁকার পাশাপাশি বৈশ্বিক আগ্রাসন, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মুখোশ উন্মোচনেও সক্রিয়। কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতো কবিগণ মার্কসবাদী চেতনাকে যে রূপ সর্বার্থে প্রপাগাণ্ডারূপে গ্রহণ করেছেন; বিপ্লবকেই একমাত্র মুক্তিমন্ত্র বলে জেনেছেন; বাস্তবায়নে সদা সক্রিয় থেকেছেন; সমর সেন তেমনটি নন। আবার সাম্যবাদও তাঁর কবিতায় বিশেষ পাত্তা পেয়েছে, তেমন নমুনা নেই।

অবশ্য, কবিকে, কবির কর্মকে বিশেষ কোনো ছকে নিবদ্ধ করে বিচার করলে কবির প্রতি অবিচার করা হয়; সেই মূল্যায়নও হয় অংশত, সামগ্রিক নয়। সমর সেনের স্বকীয়তা অন্যত্র – তিনি সময়, স্বকাল, জাতীয়-আন্তর্জাতিক রাজনীতির হালচাল, অপরাপর পরিবর্তন লক্ষ করেন অন্তর্দৃষ্টি-বহির্দৃষ্টির সমন্বয়ে; প্রকাশ করেন নির্মোহ ভঙ্গিতে। এক্ষেত্রে সমর সেনকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা সুকান্ত ভট্টাচার্য্যের থেকে সুধীন্দ্রনাথের কাছাকাছি ভাবনায় পাওয়া যাবে। সুধীন্দ্রনাথ উত্তাল বিশ্বযুদ্ধ কালপর্বকে দেখেন অনেকটা প্রতিবেদকের মতো। 'সংবর্ত' কাব্যের '১৯৪৫' কবিতার মধ্যে কবি বলেন, "এরই আয়োজন অর্ধ-শতক ধরে/ দু-দুটো যুদ্ধ একাধিক বিপ্লবে/ কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে/ মেদিনী মুখর এক নায়কের স্তবে।" ভাবনার বিবর্তনে ধীরে ধীরে প্রতিবেদক থেকে তিনি হয়ে ওঠেন প্রশ্নমুখর। এখন তিনি যিশুর মুখোমুখি, "এই পরিণামের লোভ কি/ জন্মালে নারীর গর্ভে, আত্মবলি দিলে নরমেধে।" "বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী" কিন্তু সেই মানুষ যদি হন সংবেদনশীল, সৃজনশীল, সময়-সমাজ সচেতন তবে তিনি হয়ে ওঠেন কালের

নির্মাতা। জীবনানন্দ দাশ, কাজী নজরুল, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু কেউ সে দায়বোধ এড়িয়ে যাননি। সমর সেনও ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ সময়কে ধারণ করেছেন তার কাব্যপরিসরে। কিন্তু তার বয়ান আরো বেশি বিস্তৃত, তীব্র-ঝাঁঝালো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের (১৯৩৯-১৯৪৫) সময়পর্বে তাঁর 'নানা কথা', 'খোলাচিঠি' কাব্য দুটি প্রকাশিত হয়। এ পর্যায়ে কবি প্রতিদিনকার ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাত চিত্রণের পাশাপাশি বিহার করেছেন বিশ্বমঞ্চে এবং সে ভাষাকে তিনি স্পষ্ট-শাণিত করেছেন ক্রমশ। 'রোমন্থন' কবিতার মধ্যে বিবৃত সে ইতিহাস :

ক. বয়ঃসন্ধির সময়
মহাত্মাজীর আন্দোলন শুরু হল।
লবণ আইন ভাঙে, দলে দলে জেলে যায়,
মাঝে মাঝে বিপ্লবী বোমা ফাটে
হাতে হাতকড়া, নানাবিধ রদ্দা, চরম শাস্তি।
বন্ধ সংবাদপত্র, রাস্তায় নিষিদ্ধ পোস্টার :
জর্মানরা বুঝি বা বঙ্গোপসাগরে এল।
(সমর, ১৩৮৮ : ৬৭)

খ. কারখানায় ধর্মঘট,
গ্রামে খাজনা বন্ধ কর,
জমিদার, বণিক বরবাদ,
ইনকিলাব জিন্দাবাদ,
অর্থাৎ বিপ্লবী দীর্ঘজীবী হোক।
(সমর, ১৩৮৮ : ৬৮)

ভারতবর্ষীয় রাজনীতির বহুবর্ণিল রূপ উদ্ধৃতিদ্বয়ে উপস্থিত। এক কালের ত্রাস জর্মানদের আগ্রাসি মনোভাবও উপস্থাপিত চকিতে। মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অহিংস, অসহযোগ আন্দোলন চলছে, শ্রমিক ধর্মঘট পালন করছে, কৃষক বন্ধ করেছে জমিদারের খাজনা। কিন্তু মধ্যবিত্তের উপস্থিতি নেই। তারা আত্মমগ্ন আত্মস্বার্থে; বিচলিত মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে! ব্যক্তিক স্বার্থ বিপর্যস্ত করেছে সামষ্টিক বিপ্লবকে, বৃহত্তর স্বার্থকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণি-প্রতিনিধি সমরের মানসদ্বন্দ্ব উদ্ভাসিত নানা চরণে :

এ অবস্থায় বৃন্দাবনী বাঁশি যদি চকিতে শুনি,
তাহলে বলবে লোকেঃ রোমান্টিক ভুঁইফোড়।
অত্যধিক পরিশ্রমে হতাশা চাপি,
কেননা ব্যক্তিগত গান গাওয়া কর্তব্য নয়;
যদিচ পৈত্রিক আশ্রয়ে এখনো বসবাস,
যদিচ বেকার, নিঃসঙ্গ, মনে মনে প্রেমিক।
(সমর, ১৩৮৮ : ৭৬)

'বেকার', 'নিঃসঙ্গ' যে মানুষকে মৌলিক চাহিদা পূরণের জন্য 'পৈত্রিক আশ্রয়ে' থাকতে হয়; সে কীভাবে মধ্যবিত্তজাত রোমান্টিকতা ছেড়ে, 'বৃন্দাবনী বাঁশি' রেখে মৃত্যুসঙ্কুল বিপ্লবের বাঁশি বাজাবে। কিন্তু তারপরও বিবেক জাগ্রত কবি মনে করেন :

তথাপি বামপন্থী পত্রিকায়
আসন্ন বিপ্লবের গান গাওয়া উচিত।
(সমর, ১৩৮৮ : ৭৬)

নগরজীবনের পাশাপাশি গ্রামজীবনের সমস্যা জর্জরিত আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক রূপ নির্মাণেও তিনি দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। মহাযুদ্ধের প্রকোপ কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছে সর্বস্তরে; গ্রামীণ জমিদার, জোতদার, মহাজনদের নিষ্ঠুরতা কোন পর্যায়ে পৌঁছেছে, রাজনৈতিক পালাবদলে, বৈশ্বিক আগ্রাসনে প্রান্তিক মানুষের জীবন কীভাবে বিপর্যস্ত হচ্ছে; কীভাবে দিনে দিনে প্রতিবাদী হয়ে উঠছে শ্রমজীবী মানুষ, তার পরিচয় মেলে 'সন্ধ্যানামে' কবিতার মধ্যে:

শহর ছেড়ে চলি অনেক দূরের গ্রামে।
সেখানে দেখি তুখোড় মহাজন,
আর তৃতীয় নয়নের সামনে
জীর্ণ বলদে চষা মাঠে সোনালি ফসল ফলে না,
দিনে দিনে পশ্চিমের যুদ্ধ শক্তিশেল হানে।
তাই অনেক কিষাণ আজ জমায়েত, সরবে হাঁকে,
'লাঙল যার জমি তার'।
(সমর, ১৩৮৮ : ৮৫)

শিবের 'তৃতীয় নয়নের' দোর্দণ্ড প্রতাপে কামদেব পুড়ে ভস্ম হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তির নিপীড়নে, দেশীয় জোতদার, মহাজন, কালোবাজারিদের দৌরাত্ম্যে প্রান্তিক মানুষের হয়েছে সেই একই দশা। কিন্তু মানুষের ধর্মই এই, শেষ পর্যন্ত সবকিছু এমনি ছেড়ে দেয় না। একটি সময় আসে, যাকে বলে দেওয়ালে পিঠ লেগে গেলে বিড়ালও প্রতি আক্রমণ করে, ভয়ংকর হয়ে ওঠে – বিপ্লব তাই অনিবার্য। কৃষক তখন নির্দ্বিধায় বলে ওঠে, 'লাঙল যার জমি তার'। মুটে-মজুর-শ্রমিকের কণ্ঠে ঘোষিত হয় দৃপ্ত শপথ :

বুড়ো মজুর বলে; হামারা হিন্দুস্তান নেহি দেঙ্গে।
হিম্মৎ হায়, জানোয়ার মারনেকে লিয়ে মরণকে লিয়ে তৈয়ার,
ভাই আনোয়ার, হাতিয়ার চাহিয়ে, তেজ হাতিয়ার।
(সমর, ১৩৮৮ : ৯৪)

একদিকে যখন বলিষ্ঠ কণ্ঠে বিপ্লবের মন্ত্রবাণী উচ্চারিত হচ্ছে, অন্যদিকে তখন 'পথে পথে আজ লোক নেই', 'গ্রামে গ্রামে বিপর্যয়'। এ পরিস্থিতির জন্য দায়ী আমাদের মধ্যবিত্তসুলভ নিষ্ক্রিয়তা, 'অহিংস-অসহযোগের' মতো নির্জীব আন্দোলন, এ দেশীয় 'মুষ্টিমেয় বেনে, আর মধ্যবিত্ত, পরজীবী শেঠির দালালদের' সক্রিয়তা। কিন্তু কবি মনে করেন, দুই দলের লড়াইয়ে জিতবে সংগ্রামী জনতা, 'এ করাল সংক্রান্তি নিঃসন্দেহে পার হব' 'প্রগতির সম্মিলিত বীর্যে, অক্লান্ত আত্মদানে।' সেদিন 'পুঁজিবাদ চূর্ণ হবে সারা দুনিয়ায়, লুপ্ত হবে এ হিন্দুস্তানে', 'সুদিন আসন্ন'। তাই 'কিছু রক্তশুদ্ধি, হয় হোক'।

কবি তাঁর সমগ্র কাব্যের বিরাট অংশ জুড়ে ধ্বংসযজ্ঞ আর সমাজ-সভ্যতার বিনাশী রূপ নির্মাণ করেন, একথা ঠিক; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি মুক্তিকামী; তাই নিশ্চিত করে বলতে পারেন, 'এ করাল সংক্রান্তি' কেটে যাবে'। বস্তুত, মানুষের মাঝে এই মুক্তিকামী, প্রতিরোধী, বিপ্লবী চেতনার উন্মেষ ঘটে কখন? কবি মনে করেন, বিরূপ বিশ্বের প্রতিকূলতায় মানুষ দমে গেলেও, থেমে থাকলেও শেষপর্যন্ত সে অস্তিত্বরক্ষায়, মুক্তির আস্বাদে জেগে ওঠে; যার প্রথম ধাপ মানুষের জন্মক্ষণ :

মনে কি পড়ে জনক্ষণে আমাদের প্রথম কান্না,
সে তো শিশুর প্রথম প্রতিবাদ।
(সমর, ১৩৮৮ : ১০২)

অবশ্য, চেতনার এই বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে কবি বুঝতে সক্ষম হয়েছেন কীভাবে 'সত্তার নতুন সূর্য ওঠে'।

অনেক ঘাটের জল খেয়ে বুঝি
অনেক লোক যেখানে
সেখানে সত্তার নতুন সূর্য ওঠে।
(সমর, ১৩৮৮ : ৯৮)

সম্মিলিত শক্তির নিরন্তর প্রয়াসই পারে একটি জাতিরাষ্ট্রের মুক্তি এনে দিতে। এ জন্যে প্রয়োজন 'কর্ম আর চিন্তার' সমন্বয়। কবির চিন্তাপথের নায়করা হলেন লেনিন, স্টালিন, জুখভ, গোর্কিদের মতো মহাত্মারা। যদিও তাদের পথ অনুসরণে ধেয়ে আসে 'প্রতিপদে মৃত্যু'। কিন্তু কবি মৃত্যুকে পরোয়া করেন না; কেননা তিনি বলেন, 'মৃত্যু জীবনের মাত্রা', আর একটি জীবন ও মুক্তির সূচনা। উপনিবেশের শৃঙ্খলে যার বাস, ঔপনিবেশিক শিক্ষা-চেতনা তার প্রধানতম পুঁজি। কিন্তু ঔপনিবেশিক শিক্ষার একটি বিশেষ দিক আছে। কখনও কখনও ঐ শিক্ষার গুণে উপনিবেশ-শোষিত ব্যক্তি আত্মসত্তায় উদ্বোধিত হয়; নিপীড়ক, লুণ্ঠনকারী, সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, মুক্তিমন্ত্রে উজ্জীবিত হয় মর্মে মর্মে। পৃথিবীর উপনিবেশ শাসিত সব বিখ্যাত কবি-সাহিত্যিক – গ্যাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ, ফ্রান্স কাফ্কা, চিনুয়া

আচেবে, ওউলে সোয়েঙ্কাসহ অনেকের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটেছে। সমর সেন উপনিবেশ শাসিত-শোষিত কবি। সাম্রাজ্যবাদের নৃশংসতম রূপটি তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে। তাই তাঁর কবিতা অনিবার্যভাবে হয়ে ওঠে রাজশক্তির সমালোচনা, মুক্তির বাসনা।

'তিনপুরুষ' কাব্যের মধ্যে কবি মাতৃভূমির সীমা পেরিয়ে ছড়িয়ে পড়েছেন বিশ্বরাজনীতিতে। একদিকে ভারতের স্বাধীনতা আসন্নপ্রায়, অন্যদিকে বর্মা, ইন্দোচীন, যবদ্বীপ প্রভৃতি অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শক্তি নব্য উপনিবেশ কায়েমের পাঁয়তারা করছে। কবি এ পর্যায়ে পৃথিবীর নিপীড়িত-নির্যাতিত সকল মানুষকে নিজের আত্মীয় বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কবির ভাষা :

ক. দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় মালিকেরা ফের বেঁধেছে ঘাটি;
বৈষ্ণবী বিনয়ে ইংরেজ বসেছে বর্মায়,
ফরাসীরা প্রত্যাগত ইন্দোচীনে,
গোলন্দাজহীন ওলন্দাজ ঘোরে যবদ্বীপে
ভারতের স্বাধীনতা আসন্ন প্রায় ...
(সমর, ১৩৮৮ : ১৩০)

খ. এক একদিন যন্ত্রসঙ্গীতের শব্দ স্তব্ধতাকে ছিন্ন করে,
একান্ত সে মুহূর্তে বুঝি :
জীবন আর দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়ে যারা
বাংলাদেশে, উড়িষ্যায়, মালাবারে, উত্তর বিহারে,
যারা লড়ে ইউগোস্লাভিয়ার বন্ধুর মারাঠি পাহাড়ে
রাশিয়ার রক্তমাটিতে, বেদনা হলুদ চীনে, ফ্রান্সের ফিনিক্স প্রান্তরে
আমার আত্মীয় তারা ...
(সমর, ১৩৮৮ : ১৩৬)

সমর সেন রাজনৈতিক চেতনায় এভাবেই কখনও নিজ পরিমণ্ডলে, কখনও বিশ্বচরাচরে বিচরণশীল, সমস্যার স্বরূপ উন্মোচনে সজাগ। তিনি মনে করেন, সমস্যার সমাধানের একটিই বীজমন্ত্র : 'হামারা হিন্দুস্তান নেহি দেঙ্গে।'

৩.৩

সমাজে দুটি শ্রেণি বিদ্যমান – একদিকে 'দুর্ভিক্ষের কঙ্কাল চলে আপন পথে', অন্যদিকে 'বর্ধিষ্ণু মেদে নিদ্রারত কুবেরের দুলাল'। এ অবস্থা সব কালে, সব জাতিরাষ্ট্রে কমবেশি ছিল; কিন্তু দুটি বিশ্বযুদ্ধ এ অবস্থাকে আরও তীব্র, আরও নগ্নরূপে প্রকাশের সুযোগ করে দেয়। পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষ ছিল তার নৃশংসতম রূপ।

বাংলায় এর প্রকটতা এত বীভৎস রূপে দেখা দেয়, যা এড়িয়ে যায়নি সমকালীন সংবেদনশীল কোনো শিল্পীর চোখ। জয়নুলের স্কেচ সে-পর্বের নিষ্ঠুরতম দলিল। সমরের শিল্পীমানসেও ধরা দিয়েছে মন্বন্তরের সেই মর্মান্তিক দৃশ্য :

ক. মনে পড়ে, কাছের শহরে অগণন লোক
চালের কাঙাল!
আজ তাম্রসীতা, উলঙ্গিনী, দুর্ভিক্ষকন্যা আমাদের দেশ
লঙরের সামনে অস্থিচর্মসার সন্তানের ভিড়ে নীরবে ব'সে।
(সমর, ১৩৮৮ : ১১০)

খ. এ কী ভিক্ষামূর্তি প্রভু!
ভদ্রভাবে দিন গুজরানো অসম্ভব আজ।
কোঁচার পাটে ময়লা জমে,
টেরিও থাকে না ঠিক।
(সমর, ১৩৮৮ : ১২৯)

গ. শবগন্ধ অন্ধকারে
রাস্তায় কঙ্কাল যদি জমে
তারা বলেঃ সবি ময়ার ছলনা,
কে বাঁচে কে মরে, কেউ জানে না
হরিই চরম সান্ত্বনা।
(সমর, ১৩৮৮ : ১৩১)

ধর্মকে, ঈশ্বরকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করবার জন্যে যতপ্রকার হীনকৌশল প্রয়োগ করা সম্ভব, শাসক শ্রেণি, শোষক শ্রেণি চিরকাল তা করে আসছে, আজও করে। 'হরি'র দোহাই দিয়ে তারা পৃথিবীতে মানুষের দুঃখ-দুর্দশা-দুর্ভিক্ষকে স্থায়ী করে, মানুষের-কুকুরের পঁচা শবদেহে কলঙ্কিত হয় পৃথিবী। নরায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তার দুর্বৃত্ত চরিত্রের মুখ দিয়ে যখন বলিয়ে নেন, সবকিছু ভগবানের লীলাতেই হয়, তখন বোঝা যায় শোষকশ্রেণি কী চায়! নারায়ণ তার 'দুঃশাসন', 'লুচি উপাখ্যান', 'হাড়', 'ভাঙা চশমা' প্রভৃতি গল্পের মধ্যে দেখিয়েছেন দুর্ভিক্ষ বা 'চালের কাঁকর' কোনো আকস্মিক ব্যাপার নয় বরং টাকা দিয়ে কিনে অতিযত্নে চালের সঙ্গে মেশানো হয় কাঁকর, দুর্ভিক্ষের জন্য দায়ী সুপরিকল্পিত সিন্ডিকেট। সমর সেন তাঁর নান্দনিক ভাষ্যের মধ্যে সমকালের দুঃশাসনীয় এই রূপকে অতি সচেতনভাবেই তুলে ধরেছেন।

৩.৪

বিষ্ণু দে সোজাসাপ্টা বলেছেন, 'প্রেম-ফ্রেম বাজে, আসলে আমরা নতুন খুঁজি/ নারীকে পুরুষ, পুরুষকে নারী তাইতো খোঁজে'। (বিষ্ণু, ১৩৪৪ : ৪৮)। সমর

সেনের প্রেমভাবনায় আধুনিক কবিদের মতো কাম প্রাধান্য পেয়েছে; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা প্রেম-মানবিকতার ছোঁয়ায় উৎকীর্ণ, এখানেই তার স্বাতন্ত্র্য। তিনি তথাকথিত কোমল, পেলব, রমণীয় প্রিয়ার অস্তিত্ব অনুভব করেন না; কামনাও করেন না। কবি জানেন সময়-সভ্যতার মতো প্রিয়াও 'কালো পাথরের মতো মসৃণ শরীরের' অধিকারী। তার চোখে 'নীলিমার আভাস নেই', 'নেই সমুদ্রের গভীরতা' বরং কাঙ্ক্ষিত সেই চোখে কবি দেখেছেন 'ক্ষুধার দীপ্তি', 'কঠিন ইশারা', আর 'হিংস্র হাহাকার', যেখানে প্রেম-কাম হয়ে ওঠে অভিন্ন সত্তা। সমালোচকের ভাষায় :

> উদ্ভিন্ন যৌবন কামনা আধুনিক বাংলা কাব্যের একটি অভ্যস্ত বিষয় বলে গণ্য অন্ততঃ 'কড়ি ও কোমল' থেকে শুরু করে। কিন্তু রেওয়াজ মাধুর্যের আধিক্য এতই যে যৌনোন্মেষের তিক্ততার দিকটা প্রায়শই অস্বীকৃত থেকে যায়। প্রেম তাই লজেঞ্চুষের মতো মিষ্টি ও শরবতের মতো তরল পদার্থ বলে বোধ হয়। কিন্তু সমরদার কবিতায় যৌনতা ও প্রেম আশংকায় সঙ্গীন। (রণজিৎ, ১৯৮৮ : ৩৩)

যুদ্ধপীড়িত, যুদ্ধ-আসন্ন ভঙ্গুর, নিঃসঙ্গ, নিরাশ্রয়, নিরালম্ব, বেকার অথচ সময়-রাজনীতি সচেতন মানুষের পক্ষে রোমান্টিক ভাবালুতাময় 'লজেঞ্চুষের মতো মিষ্টি' এলায়িত ফেনায়িত প্রেম করবার সময় কোথায়? কেননা :

> বৃষ্টির আগে ঝড়, বৃষ্টির পরে বন্যা। বর্ষাকালে
>
> অনেক দেশে যখন অজস্র জলে ঘরবাড়ি ভাঙবে,
>
> ভাসবে মূক পশু আর মুখর মানুষ,
>
> নগরের রাস্তায় যখন সদলবলে গাইবে দুর্ভিক্ষের স্বেচ্ছাসেবক, তোমার মনে তখন মিলনের বিলাস
>
> ফিরে তুমি যাবে বিবাহিত প্রেমের কাছে।
>
> হে ম্লান মেয়ে প্রেমে কী আনন্দ পাও,
>
> কী আনন্দ পাও সন্তান ধারণে?
>
> (সমর, ১৩৮৮ : ১৬)

এমন বিরূপ পরিবেশে শাশ্বত প্রেম-বিবাহ-সংসার-জীবন অত্যন্ত হাস্যকর বৈকি। তাই প্রেমের অপ্রাপ্তিতে, অতৃপ্তিতে রোমান্টিক কবিদের মতো হা-হুতাশ করবার সময় কিংবা মানসিকতা কোনোটিই নেই কবির। এরূপ পরিস্থিতিতে কবিকে যখন কেউ এসে জানায়, 'কাল রাত্রে মিলির বিয়ে হয়ে গেছে', ঠিক পরমুহূর্তেই সেই আগন্তুক অথবা কবির বাস্তববোধ বলে ওঠে, 'ও কিছুই নয়; ক-দিনই বা মনে থাকবে'। বিষাদাক্রান্ত কবির ভাবনায় উঠে আসে বিকৃত বিলাসের চিত্র :

> একটি মানুষকে ভুলতে কতো দিনই আর লাগে,
>
> কতোদিনই লাগে শরীর থেকে মুছে ফেলতে
>
> আর একজনের শরীর-সর্বস্ব আলিঙ্গন;

মধ্যবিত্ত আত্মার বিকৃত বিলাস,
স্যাকারিনের মতো মিষ্টি
একটি মেয়ের প্রেম!
(সমর, ১৩৮৮ : ২৬)

সমরের প্রেমদৃষ্টির স্বকীয়তা এইখানে – আধুনিক মানুষের জীবন শুধু প্রেমের মধ্যে সীমায়িত নয়; বিরহ-বিলাস নিয়ে আক্ষেপ করবার সময় নেই। কিন্তু কবি অন্য আধুনিক কবিদের মতো প্রেমের বিরহে নিতান্ত নির্বিকার নন; বিবেক-উৎসারিত বোধ তাকে মুক্তি দেয় না, আঘাতে জর্জরিত করে, মধ্যবিত্ত সুলভ 'বিকৃত বিলাসের' জন্য নিজেকে বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করতে সংকোচ বোধ করেন না। দুঃসময়ের প্রাণদায়ী প্রিয়াকে মনে পড়ে কোনো এক বেখেয়াল মুহূর্তে। কবি আত্মদগ্ধ যন্ত্রণায় ফিরে যান অতীতে, প্রেমে।

তবে কোনো এক রাত্রে রতি বিহারের সময়
হঠাৎ তোমাকে মনে পড়বে,
আর সেদিন সমস্ত রাত
চোখে আর ঘুম আসবে না।
(সমর, ১৩৮৮ : ২৫)

এভাবে কবি প্রেমকে নিতান্ত দেহবাদের মধ্যে সীমায়িত না রেখে মন-মানবিকতার পরশে মহিমান্বিত করেছেন; বস্তুত, "সুসভ্যরাই মনে করে কাম-প্রেমের প্রভেদ অত্যন্ত সূক্ষ্ম [...] কালচারের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েই কাম প্রেমে পরিণত হয়।" (ক্লাইভ, ২০১৪ : ৩৮)। কবির প্রেমভাবনায় উদ্ভাসিত কাম-প্রেমের অভিন্ন রূপ; যা সমর সেনের প্রেমস্বাতন্ত্র্যের বিশেষ দিক।

৪.

সমর সেন খাঁটি গদ্য ছন্দের কবি। "বাংলা গদ্য ছন্দে এই তরুণ কবি যে-রূপ দিয়েছেন সেটা আর কারোরই নয়; তিনি আবিষ্কার করেছেন এই ছন্দের অভিনব ধ্বনি ও প্রতিধ্বনি।" (বুদ্ধদেব, ২০০২ : ১৭৪)। "তোমার লেখনী কাব্যের যে নতুন সীমানায় যাত্রা করেছে যে আমার অপরিচিত, শুধু আমার নয়, সাধারণের কাছে এর ম্যাপ এখনো স্পষ্ট রেখায় চিহ্নিত হয় নি।" (রবীন্দ্রনাথ, ১৯৮৮ : ৩) সমর সেনের গদ্য ছন্দের 'ম্যাপ' সাধারণের কছে স্পষ্ট না হওয়ার কারণ – গদ্যছন্দ। বাংলা কবিতায় অবশ্য গদ্যছন্দের ব্যবহার এর আগে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছেন – আংশিক; ফলে গদ্যছন্দের যে ভাবঔদার্য তা ঠিকঠাক প্রকাশ পায়নি। সমর নিঃশঙ্কচিত্তে, প্রথমবারের মতো দেখালেন অন্ত্যমিল, অনুপ্রাস, কাব্যঢং ছাড়াও কবিতা

হতে পারে। এবং তা একান্তই মুখের আলাপ, ঘরোয়া অনুষঙ্গ, গদ্যকথা পাশাপাশি বসালেও হতে পারে :

পাণ্ডব-বর্জিত এ দেশ।
সকাল বৃষ্টি, বিকেলে মন্ত্রী,
হাট নষ্ট।
চারিধারে ধানক্ষেত ভেসে গেল, বৃষ্টি আর থামে না।
দলে দলে তাই চলেছি সভায়,
দেখি আগন্তুক মন্ত্রী কী বলেন।
(সমর, ১৩৮৮ : ৭৯)

একেবারে গদ্যলেখা; কাহিনির বর্ণনা। অলঙ্কার প্রয়োগে কোন চাপ নেই; অনুপ্রাস নেই, মিল নেই। কিন্তু সামগ্রিক বক্তব্যে কবিত্বের অভাব নেই; গদ্যের রূঢ়তার মধ্যেই পাঠকের কানে একটি ভিন্নধর্মী সুর বেজে ওঠে। তাই উদাহরণটি শেষ পর্যন্ত গদ্য নয়, কবিতা। সমর সমগ্র কবিতায় গদ্য নিয়ে খেলেছেন; কথার পর কথা, বক্তব্যের পর বক্তব্য সাজিয়ে এক একটি গল্প নির্মাণই যেন তাঁর লক্ষ্য। এই ভাঙামধুর ছন্দ কখনও চলেছে ধীর লয়ে, কখনও দ্রুতগতিতে। এভাবে তিনি বাংলা কবিতায় গদ্যছন্দের সাথে নিজের নামকে স্থায়ী করে রাখলেন।

বক্তব্যের প্রয়োজনে, বিষয়ের উপস্থাপনায় সমর সেন বিভিন্ন অলঙ্কার ব্যবহার করেছেন; আরোপিত নয়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কবি উপমা ব্যবহার করেছেন লোকায়ত জীবনের পরিচিত উপাদান-অনুষঙ্গ থেকে। উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তির ব্যবহারেও তিনি সাবলীল; প্রায় প্রতিটি অলঙ্কার শেষ পর্যন্ত রূপ নিয়েছে চিত্রকল্পে; "হয় যান্ত্রিক, নয় বিকৃত যৌনতা অথবা বিকল্প যৌনতা – তারই ইমেজের মধ্য দিয়ে সমর সেন আধুনিক নগরের তথা বর্তমান সভ্যতার অবক্ষয়ী বন্ধ্যাত্বের চেহারা এঁকেছেন।" (অশ্রুকুমার, ১৩৯২ : ২৩৩) কবি যখন "বিষাক্ত সাপের মতো আমার রক্তে/ তোমাকে পাবার বাসনা" (সমর, ১৩৮৮ : ২২), "হিংস্র পশুর মতো অন্ধকার এল/ তখন পশ্চিমের জ্বলন্ত আকাশ রক্তকরবীর মতো লাল" (সমর, ১৩৮৮ : ২৩), "শীতের আকাশে অন্ধকার ঝুলছে শূয়রের চামড়ার মতো" (১৩৮৮ : ৩২) অথবা "রাত্রে চাঁদের আলোয় শূন্য মরুভূমি জ্বলে/ বাঘের চোখের মতো" (১৩৮৮ : ৩৩) প্রভৃতি উপমা ব্যবহার করেন তখন তার মূল প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে যায়। 'বিষাক্ত সাপ', 'হিংস্র পশু', 'শূয়রের চামড়া' 'বাঘের চোখ', একদিকে যেমন হিংস্রতার পরিচায়ক তেমনি সমকালের নগ্নবাস্তবতাকে তুলে ধরে চরমভাবে। এমন নির্মম পরিবেশে সমর নিজেকে ভাবেন, "আমার অন্ধকারে আমি/ নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর, নিঃসঙ্গ।" (১৩৮৮ : ২৩)

উৎপ্রেক্ষার ব্যবহারে কবি অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। "শীতের দিনে অনেক দূরের পাহাড় যেন কাছে সরে আসে" (১৩৮৮ : ৫১), "আসন্ন হেমন্তে/ মৃত্যু সহসা ঝুঁকে পড়ে চারিদিকে/ নিঃসঙ্গ বটে/ যেন পূর্বপুরুষের স্তব্ধপ্রেত" (১৩৮৮ : ৬১), সত্যই কি শীতের দিনে দূরের পাহাড় কাছে সরে আসে? অথবা হেমন্তে মৃত্যু কি ঝুঁকে পড়ে? কবি নিজেই সন্দিহান। এ সন্দেহ চলমান, তাই "কালসিটে কালোমেঘ, সূর্যাস্তের রঙ" দেখেও মনে হয়, "যেন মানুষের খুন" (১৩৮৮ : ১২৬), "বুড়ো দিন সোনার কলপ মাথায় লাগায়" (১৩৮৮ : ৮৭), "অনেক মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ায়/ আজ ২২শে শ্রাবণ" (১৩৮৮ : ৯০)-এর মতো সমাসোক্তির মধ্যেও সময়-সংকটের ইশারা বিদ্যমান।

প্রতিটি উপমা, উৎপ্রেক্ষা, সমাসোক্তির মধ্যে সমকালীন জীবন বাস্তবতার নানা অনুষঙ্গ যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা একদিকে যেমন বিস্ময়কর, অন্যদিকে তেমনি বিচিত্র তাৎপর্য বহন করে। এগুলো পাঠকের মস্তিষ্কে সৃষ্টি করে বস্তুজগতের কল্পময় উপস্থিতি। চিত্রকল্পের কিছু ব্যবহার সমরের কবিতায় থাকলেও চিত্র নির্মাণে তাঁর কাব্যপ্রতিভা শুধু জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে তুলনীয়। কবিতার পর কবিতায় কবি ছবি এঁকেছেন – সময়, সমাজ, রাষ্ট্র – পৃথিবীর; যার না আছে বিরাম, না আছে বিষণ্নতা :

> চিৎপুরের বারান্দায় কোকিল ডাকে,
> অলস হাই তোলে বেকার কুকুর।
> দেব নখরে লোলচর্ম, পীত চোখ
> ক্রমে ক্রমে গঙ্গাতীরে নিরানন্দ নারীদল জমে।
> (সমর, ১৩৮৮ : ৬০)

সমরের কবিতায় এমন অসংখ্য ছবি রূপায়িত হয়েছে যা পাঠককে আরও বেশি ইন্দ্রিয়-সম্পৃক্ত করে তোলে। কবিতার শরীরে খেলা করে সৌন্দর্যের লীলা।

সমর সেন কিছু শব্দ ব্যবহার করেছেন যা পাঠককে তার প্রবণতা বুঝতে সাহায্য করে। অন্ধকার, কাক, শকুন, কুকুর কবির প্রিয় উপাদান। অন্ধকার এসেছে সামূহিক বিশ্বের অবক্ষয়, ক্লেদ-ক্লান্তির রূপকে; কাক-শকুন সাম্রাজ্যবাদী-পুঁজিবাদী শক্তির আগ্রাসি ভূমিকায়; ভিখিরি কুকুর, বেকার কুকুর, প্রভুহীন কুকুর ব্যবহৃত হয়েছে দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের অসহায়ত্ব প্রকাশে, মধ্যবিত্ত শ্রেণির রূপকে।

যত্রতত্র পুরাণের ব্যবহার সমর না করলেও তাঁর ব্যবহৃত পুরাণসমূহ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ, ব্যঞ্জনাঋদ্ধ। পাণ্ডু সংগমরত মৃগমিথুনকে পঞ্চবাণে বিদ্ধ করে মৃগমিথুনরূপী মুনি কিমিন্দামের শাপপ্রাপ্ত হয়। নিজের পাপেই পাণ্ডু ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। সভ্যতার সকল অর্জন মানুষের প্রচেষ্টার ফল। আবার সেই মানুষই উদ্ভাবন করেছে সভ্যতা ধ্বংসের সকল আয়োজন। তার দশা পাণ্ডুর মতোই। কবি তাই বলেন 'আমাদের মৃত্যু হবে পাণ্ডুরের মতো'। কবি 'আত্মসমালোচনা' কবিতার মধ্যে রাম-

রাবণের পুরাণ কাহিনির রূপকে শোষিত শ্রেণি ও সাম্রাজ্যবাদী ঔপনিবেশিক শ্রেণির চিত্র এঁকেছেন এবং শেষ পর্যন্ত 'নিশ্চিত' প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন পরাজয়ের মালা 'রাবণের গলায়' ঝুলবে। চিত্রাঙ্গদা, অর্জুন, ইন্দ্র, ইন্দ্রজিৎ, বিভীষণ, ক্ষাত্রবীর্য, ঊর্বশী, মৈনাকসহ আরও কিছু পুরাণ প্রসঙ্গকে প্রয়োজনানুসারে ব্যবহার করেছেন কবি।

ভাষার সহজ-সাবলীল-স্বতঃস্ফূর্ততার সৌকর্যই সমরের গদ্য কবিতার বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ব্যঙ্গ বিদ্রূপাত্মক ভাষিক চাতুর্যে তিনি নিপুণতার পরিচয় দিয়েছেন। বিদ্রূপ রূপ নিয়েছে বিদ্রোহে। "বস্তুত এই বিদ্রূপ ও বিদ্রোহের মিলিত রাগিণী সৃষ্টি বাংলা কাব্যে সমর সেনের একান্ত নিজস্ব এবং স্থায়ী অবদান" (অমলেন্দু, ২০০২ : ১৮০)। তাঁর ব্যঙ্গের প্রধান লক্ষ্য মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুবিধাভোগী জীবন। পুঁজিবাদী, ঔপনিবেশিক শক্তিকেও বিদ্রূপের বাণে বিদ্ধ করেছেন কবি।

সাপ যত বসে আছে শিকারের তালে।
রাত্রি এল, মৃত্যু লেখা ব্যাঙের কপালে ॥
মহাজন গান গায় নদারৎ ধান।
অন্ধকার প্রেতলোকে ভাবে ভগবান ॥
অক্ষম এ রায়বার ঈশ্বরের কথনে।
প্রভুর বন্দনা শুনি বেনের ভবনে ॥
(সমর, ১৩৮৮ : ১১৯)।

'আপনি বাঁচলে বাপের নাম', 'পাকা ধানে মই', 'দিন আনি দিন খাই', 'ডাকে কুমির কাটে খাল', 'কূপমণ্ডুকের মতো' প্রভৃতি দেশীয়-লোকায়ত প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারের পাশাপাশি কাদা খোঁচা, জাঙ্গাল, ভাগাড়ের মতো লোকজ শব্দও ব্যবহার করেছেন অল্প-বিস্তর; তৎসম শব্দের পরিমিত ব্যবহারও সুখপাঠ্য। হিন্দি শব্দ-বাক্যের পাশাপাশি প্রচুর নিত্য প্রচলিত বিদেশি শব্দ– হামেশা, হারামি, দুনিয়া, শরিফ, জিন্দেগি, বনিয়াদ, দুশমন, ক্রিসমাস, চার্টার, লাট প্রভৃতি শব্দও ব্যবহার করেছেন অবলীলায়।

চিত্রকলাকে কেন্দ্র করে ইমপ্রেশনিজমের (Impressionism) বিকাশ ঘটলেও কবি-সাহিত্যিকগণ এ পদ্ধতিকে দ্রুতই তাদের প্রকাশ-প্রকরণে গ্রহণ করেছিলেন। জগৎজীবনের নানারূপ রস, পরিবেশ, পরিস্থিতিকে আলোর প্রতিসাম্যে, সময়ের বিভিন্নতায়, রঙের রেখায় প্রকাশ করা একজন ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পী বা কবির প্রধান কাজ। "সমরসেন বস্তুপ্রকৃতি নিরীক্ষণে দৃষ্টি ইন্দ্রিয়ের তীব্রতায় আসক্ত, আলোর মাধ্যম ব্যবহার তার ক্ষেত্রে অনিবার্য বিষয়।" (আকতার, ২০০২ : ৯৯)। সমকালীন সংকটের বীভৎস রূপ, কলকাতা-দিল্লী-শালবন ইত্যাদি স্থানের বাস্তব সমর্থিত রূপ, ভারতবর্ষীয় রাজনীতির উত্থান-পতন, মধ্যবিত্তের দোলায়িত জীবন রূপায়ণে কবি আলো ও বিভিন্ন রঙের যথার্থ ব্যবহার করেছেন; যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে ফবিজম (Fobism), এক্সপ্রেশনিজমের (Expressionism) বৈশিষ্ট্য ধারণ করেছে।

১. স্তব্ধরাত্রে কেন তুমি বাইরে যাও?
আকাশে চাঁদ নেই, আকাশ অন্ধকার, (সমর, ১৩৮৮ : ১৩)

২. আজ ছিন্নভিন্ন প্রাণ পলাশ, রক্তকরবী :
অন্ধকার সূর্যের ধ্বনি প্রতিধ্বনি। (সমর, ১৩৮৮ : ১০৬

৩. ছানি পড়া চোখে
অন্ধকার নীল বিদ্যুত চমকায়। (সমর, ১৩৮৮ : ১০৭)

৪. বাসের সামনে ভিখিরিরা ভিড় করে ...
নিচে বিবর্ণ বস্তি
আর হলুদ ঘাসের মাঠ। (সমর, ১৩৮৮ : ৪৩)

কবি এভাবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনের সমস্যাকে অন্ধকার, সন্ধ্যা, পলাশ, রক্তকরবী, লাল, নীল, হলুদ রঙের ব্যবহারে উপস্থাপন করেছেন ।

৫.

সাজ-সাজ রব, উৎসবের উল্লাস আর মোহমুগ্ধাচ্ছন্ন মায়াময় পরিবেশে বিদায় গ্রহণ অনেকের কাম্য; অধিকাংশই তা পারে না। কেননা মানুষের মায়া প্রবল। সমর সেন ব্যতিক্রম–কী চরিত্রে, কী কর্মে; ভরা পেয়ালা মুখে থাকতেই তিনি মুখ ফিরিয়ে নেন। খ্যাতি, ক্ষমতা, সামর্থ্য সবকিছুতেই যখন সাফল্যের শীর্ষে, তখনই তিনি বাংলা কবিতা লেখা বন্ধ করেন; কবিতার রহস্য আরোপ করেন নিজের জীবনে। কিন্তু তার আগে বাংলা কবিতার আসরে নিশ্চিত করেছেন নিজের আসন – সময়, সংকট, স্বকাল, স্বদেশ, বিদেশের সমস্যার শৈল্পিক রূপায়ণে; বিশেষত গদ্যছন্দ নির্মাণে। নগরজীবনের ক্রূরতা-দ্বেষ আর নানামাত্রিক বাস্তবতার নগ্ন রূপায়ণে তিনি নির্মম। ভারতবর্ষীয় ও বিশ্বরাজনীতির উত্তাল সময়ের সচেতন নাগরিক কবি। যদিও সে রহস্য আজও উন্মোচিত হয়নি; কেন কবিতা ছাড়লেন প্রিয়তম কবি!

টীকা

১. বাখতিন (১৯৯৪) তাঁর 'দ্য ডায়ালজিক ইমাজিনেশন' গ্রন্থের 'ডিসকোর্স ইন দ্য নোভেল' (২৫৯-৪২২) অংশের মধ্যে উপন্যাসের ভাষার সঙ্গে কবিতার ভাষার তুলনামূলক আলাপকালে বিভিন্নভাবে বলবার চেষ্টা করেছেন, কোনো একটি প্রচলিত, জীবিত শব্দ একটি নির্দিষ্ট অর্থের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না; শ্রেণি, পেশা, স্থান, কাল-পাত্রভেদে প্রতিমুহূর্তে নতুন কোনো বৈশিষ্ট্য ধারণ করে এবং এই অর্থ ধারণের সময় বা প্রকাশকালে উক্ত শব্দটি আরও নতুন নতুন অর্থের, বৈশিষ্ট্যের সম্ভবনাগুলোকেও সামনে আনে। এসব সম্ভাবনা ছাড়াই একক অর্থে শব্দকে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন শুধু 'আদম'। বাস্তবিক পক্ষে যা আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

২. সমর সেনের প্রকাশিত কাব্য পাঁচটি : 'কয়েকটি কবিতা' (১৯৩৭), 'গ্রহণ' (১৯৪০), 'নানা কথা' (১৯৪২), 'খোলাচিঠি' (১৯৪৩), 'তিনপুরুষ' (১৯৪৪)।

৩. দীনেশচন্দ্র সেন ৩ নভেম্বর, ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা জেলার বগজুড়ি গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সমর সেনের পিতামহ।

গ্রন্থপঞ্জি

অশ্রুকুমার সিকদার (১৩৯২)। *আধুনিক কবিতার দিগবলয়*। পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, অরুণা প্রকাশনী : কলকাতা

খালেদ হোসাইন ও সাজজাদ আরেফিন [সম্পা.] (২০০২), *সমর সেন*, দিব্য প্রকাশ, ঢাকা

বাসন্তী কুমার মুখোপাধ্যায় (১৯৯৪)। *আধুনিক বাংলা কবিতার রূপরেখা*, ৩য় সংস্করণ, প্রকাশ ভবন : কলিকাতা

বিষ্ণু দে (১৯৯৩)। *চোরাবালি*, পঞ্চম সিগনেট সংস্করণ, কলকাতা

সমর সেন (১৯৮১)। *বাবু বৃত্তান্ত*, দে'জ পাবলিশিং (প্রথম প্রকাশ, ১৯৭৮), কলকাতা

সমর সেন (১৩৮৮ ব.)। *সমর সেনের কবিতা*, পঞ্চম পরিবর্ধিত সংস্করণ, সিগনেট প্রেস, কলকাতা

সুকুমার সেন (২০০৭)। *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস*, (৫ম খণ্ড), চতুর্থ মুদ্রণ, আনন্দ পাবালিশার্স, কলকাতা

প্রবন্ধ

অমলেন্দু বসু। "সমর সেনের কবিতা", *সমর সেন* [সম্পা. খালেদ হোসাইন ও সাজজাদ আরেফিন], দিব্য প্রকাশ, ঢাকা

বুদ্ধদেব বসু। "নব যৌবনের কবিতা", *সমর সেন* (প্রাগুক্ত)

বেগম আকতার কামাল। "সমর সেনের কবিতায় রঙের ব্যবহার", সমর সেন (প্রাগুক্ত)

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়। "আধুনিক কবিতার আততি – সমর সেন", সমর সেন (প্রাগুক্ত)

পত্রিকা

রণজিৎ গুহ (১৯৮৮)। *শান্তি নেই*, 'অনুষ্টুপ' সমর সেন বিশেষ সংখ্যা (সম্পাদনা : পুলকচন্দ, সম্পাদক : অনিল আচার্য), দ্বাবিংশ বর্ষ : দ্বিতীয়-তৃতীয় সংখ্যা, কলকাতা

অনূদিত গ্রন্থ

ক্লাইভ বেল (২০১৪)। *সভ্যতা*। মোতাহের হোসেন চৌধুরী অনূদিত, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, প্রথম সংস্করণ, ঢাকা

ইংরেজি গ্রন্থ

Bakhtin, M.M (1994), *The Dialogic Imagination : Four essays,* Edited by Michael Holquist, Translated by Caryl Emerson and Michael Holquist, Ninth Paper back prinitig, University of Texas Press, Austin.